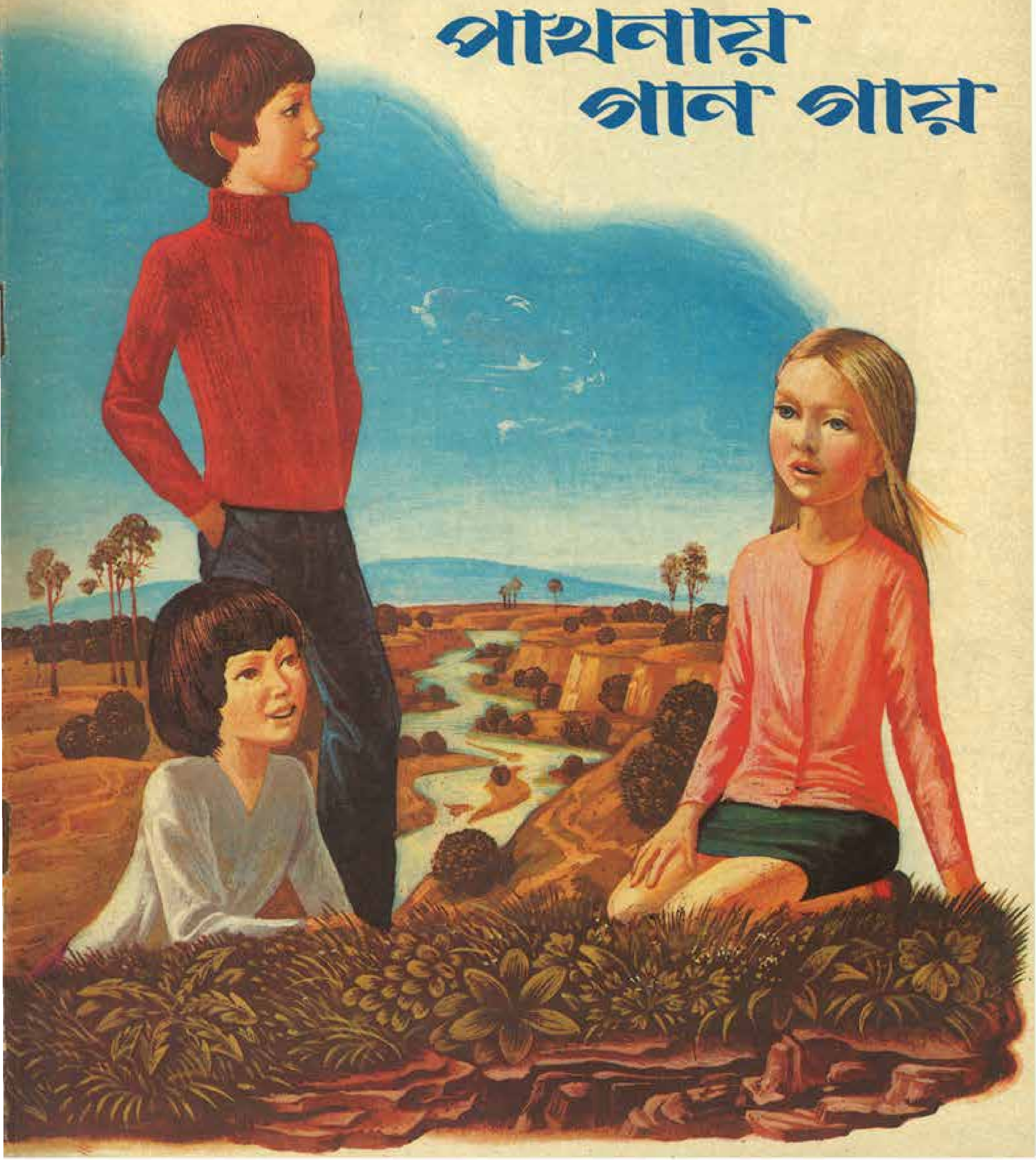
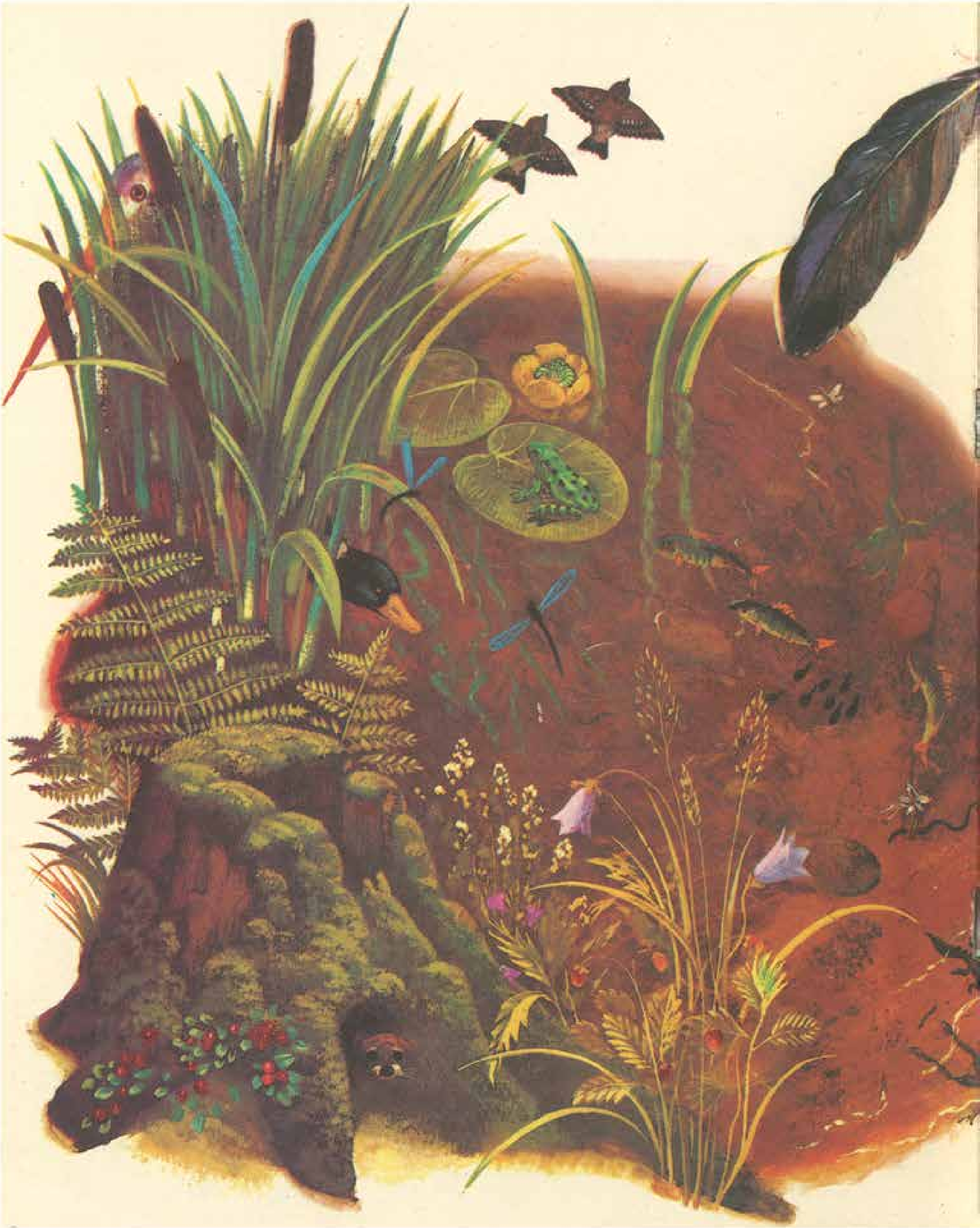
ভাসিলি সুখম্‌লিন্‌স্কি

পাখনায় গান গায়







ভাসিলি
সুখমলিনস্কি

পাখনায় গান গায়

গল্প ও রূপকথা

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো





আমাকে বলতে দাও

স্কুলের দিদিমণি কাতেরিনা ইভানোভ্না তাঁর ছোট ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মাঠে নিয়ে এসেছেন। শরতের প্রথম দিকের এক শান্ত সকাল। পাখিরা বাসা বদল করতে চলেছে। দূর আকাশে তারা উড়ে চলেছে ঝাঁক বেঁধে। তারা মৃদু কলধ্বনি তুলছে। তাদের কলধ্বনিতে বিষাদে আচ্ছন্ন স্তেপের তৃণভূমি।

কাতেরিনা ইভানোভ্না ছেলেমেয়েদের বললেন:

'আজ আমরা শরতের আকাশ আর বাসাবদলকারী পাখিদের নিয়ে রচনা তৈরি করব। তোমরা প্রত্যেকে বলবে আকাশ কার কাছে কেমন মনে হচ্ছে। তাকিয়ে দেখ, ভালো করে তাকিয়ে দেখ সবাই। তোমাদের মাতৃভাষায় সুন্দর সুন্দর, লাগসই শব্দ খুঁজে বার কর।'

ছেলেমেয়েদের কোলাহল শান্ত হয়ে এলো। তারা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে শুরু করে দিল। এক মিনিট যেতে না যেতেই শোনা গেল গোড়ার দিককার ছোট ছোট রচনা।

'আকাশ ঘন নীল...'

'আকাশ ফিকে নীল...'

'আকাশ পরিষ্কার...'

'আকাশ আসমানীরঙা...'

ব্যস্। ছেলেমেয়েরা বারবার আওড়াতে লাগল সেই একই কথা: ঘন নীল, ফিকে নীল, পরিষ্কার, আসমানীরঙা...

ছোট্ট, নীলচোখ মেয়েটি ভালিয়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে।

'আচ্ছা, তুমি চুপ করে আছ কেন, ভালিয়া?'

'আকাশ দরদভরা,' মৃদুস্বরে এই কথা বলে ভালিয়া বিষণ্ণ হাসি হাসল।

ছেলেমেয়েরা চুপ করে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তারা এমন জিনিস দেখতে পেল, যা এর আগে তাদের চোখে পড়ে নি।

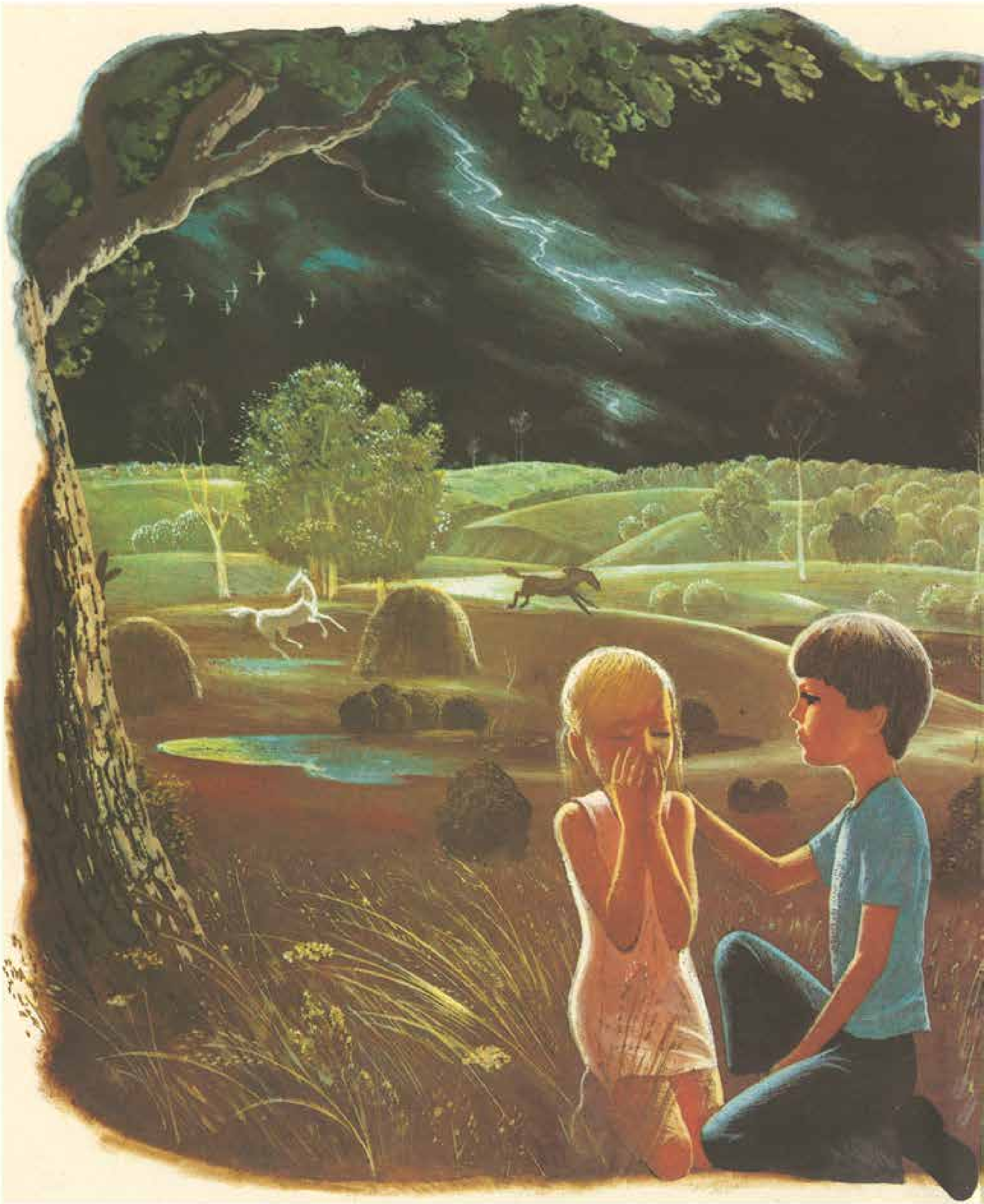
'আকাশ মন-মরা...'

'আকাশের কষ্ট হচ্ছে...'

'আকাশের মন ভার...'

'আকাশ কনকনে...'

আকাশ খেলা করে চলছিল, আকাশ মৃদু মৃদু কাঁপছিল, নিশ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছিল যেন একটা জীবন্ত প্রাণী, আর ছেলেমেয়েরা তাকিয়ে ছিল তার শরতের ঘন নীল, ব্যথাতুর চোখের দিকে।





আমি ডরাই না— মেঘের ডাক না, বিদ্যুৎও না

জুন মাসের বেজায় গরম দিনটা। ক্লাস ফাইভের ছেলেমেয়েরা সারা দিনের মনে বনে গেছে।

বনে বেশ মজা। ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করল, মজার মজার বই পড়ল, জাউ বানিয়ে খেল।

সন্ধ্যা নাগাদ বনের ওপাশ থেকে হানা দিল কালো মেঘ, ডেকে উঠল গুরু গুরু শব্দে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য সকলে ছুটল রাখালদের আস্তানা লক্ষ্য করে। ভিতিয়াও ছুটল। এমন সময় চমকে উঠল বিদ্যুৎ, একটা প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দ কানে এমন তালা ধরিয়ে দিল যে ভিতিয়া ভয়ে বড় একটা ওক গাছের তলায় বসে পড়ে চোখ বুজে ফেলল, সে প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি। সে সাহায্য চেয়ে চিৎকার করার জন্য সবে হাঁ করেছে, এমন সময় পাশে দেখতে পেল তাদেরই ক্লাসের মেয়ে ভালিয়াকে।

'তুই নাকি রে ভিতিয়া? ওঃ, কি ভালোই না হল! — আমি একা নই। এখন আমার ভয় লাগছে না।'

ভিতিয়া একটু থেমে নিশ্বাস নিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখল। প্রবল বৃষ্টির ধারায় বন ঢেকে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মুহূর্তের নীলচে আলোয় ঝলমল করে উঠছে বড় বড় গাছপালা আর ঝোপঝাড়। বনে সাড়া পড়ে গেছে, বন কাতরাচ্ছে। ভিতিয়ার মনে হচ্ছিল যেন এই বিশ্বসংসারে সে আর ভালিয়া ছাড়া আর কেউ নেই। ভয়ের কথা ভাবতেই তার লজ্জা হচ্ছিল। তোমার পাশে যখন একটা মেয়ে আর তার দায়িত্ব যখন তোমার ওপর তখন কি ভয় করলে চলে?

'ডরাস নে ভালিয়া,' ভিতিয়া বলল। 'আমি ডরাই না — মেঘের ডাক না, বিদ্যুৎও না।'

ভালিয়ার সাদাটে চুলের বেণী ভিতিয়া হাত দিয়ে সামান্য ছুঁল। এখন আর সে কোন কিছুকেই ডরায় না।





পেত্রিক কেন কেঁদেছিল

ছোট্ট পেত্রিককে বাড়িতে রেখে তার মা গেলেন রুটির দোকানে।

পেত্রিক খোলা জানলার দিকে এগিয়ে গেল।

জানলার তাকে ছিল একটা ফুলদানি।

একটা বড় রঙবেরঙের প্রজাপতি এসে বসল ফুলদানির কানায়। পেত্রিকের ভারি ইচ্ছে হল প্রজাপতিটা ধরে। জানলার তাকে কনুই ঠেকিয়ে হাত বাড়াতে গিয়ে ফুলদানির গায়ে ধাক্কা লাগল। ফুলদানিটা পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

'এখন কী হবে? মা কী বলবে?' — এই ভেবে পেত্রিক দারুণ ভয় পেয়ে গেল।

পেত্রিক ভাঙা টুকরোগুলো উঠিয়ে জড় করে সবজি বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে ছোট্ট কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে সেগুলো সে পুঁতে ফেলল। তারপর জানলার ধারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল মা'র জন্য।

মা দরজা খুলতেই পেত্রিক তাঁর কাছে ছুটে এসে বলল:

'মা, ফুলদানিটা কিন্তু আমি ভাঙি নি। ভাঙা টুকরোগুলোকে বাগানে নিয়ে গিয়ে ছোট কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে আমি পুঁতি নি।'

মা'র দুচোখে পেত্রিক উদ্বেগের আঁচ পেল।

'কে তাহলে ফুলদানিটা ভাঙল, শুনি?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রজাপতি,' মৃদুস্বরে জবাব দিল পেত্রিক।

মা মৃদু হাসলেন।

'প্রজাপতি কী করে ফুলদানি ভাঙল, এটা না হয় বোঝা গেল,' মা বললেন। 'কিন্তু কী করে সে ভাঙা টুকরোগুলোকে বাগানে নিয়ে গিয়ে পুঁতল বল্ দেখি।'

পেত্রিক মা'র দিকে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।





কোন্‌টা বেশি ভালো?

একটা ছোট্ট মেয়ে প্রশ্ন করতে ভালোবাসত।

'কোন্‌টা বেশি ভালো?' সে তার মা'কে জিজ্ঞেস করত। 'আপেল, না নাশপাতি? গোলাপ, না গ্ল্যাডিওলাস্‌? জল, না লেমোনেড? বল্‌, না পুতুল? — কোন্‌টা?'

মা ধৈর্য ধরে উত্তর দিতেন, কিন্তু মনে মনে অবাক হতেন।

আসল কথা, বল্‌ না পুতুল, গোলাপ না গ্ল্যাডিওলাস্‌ — কোন্‌টা বেশি ভালো তা কি বলা যায়?

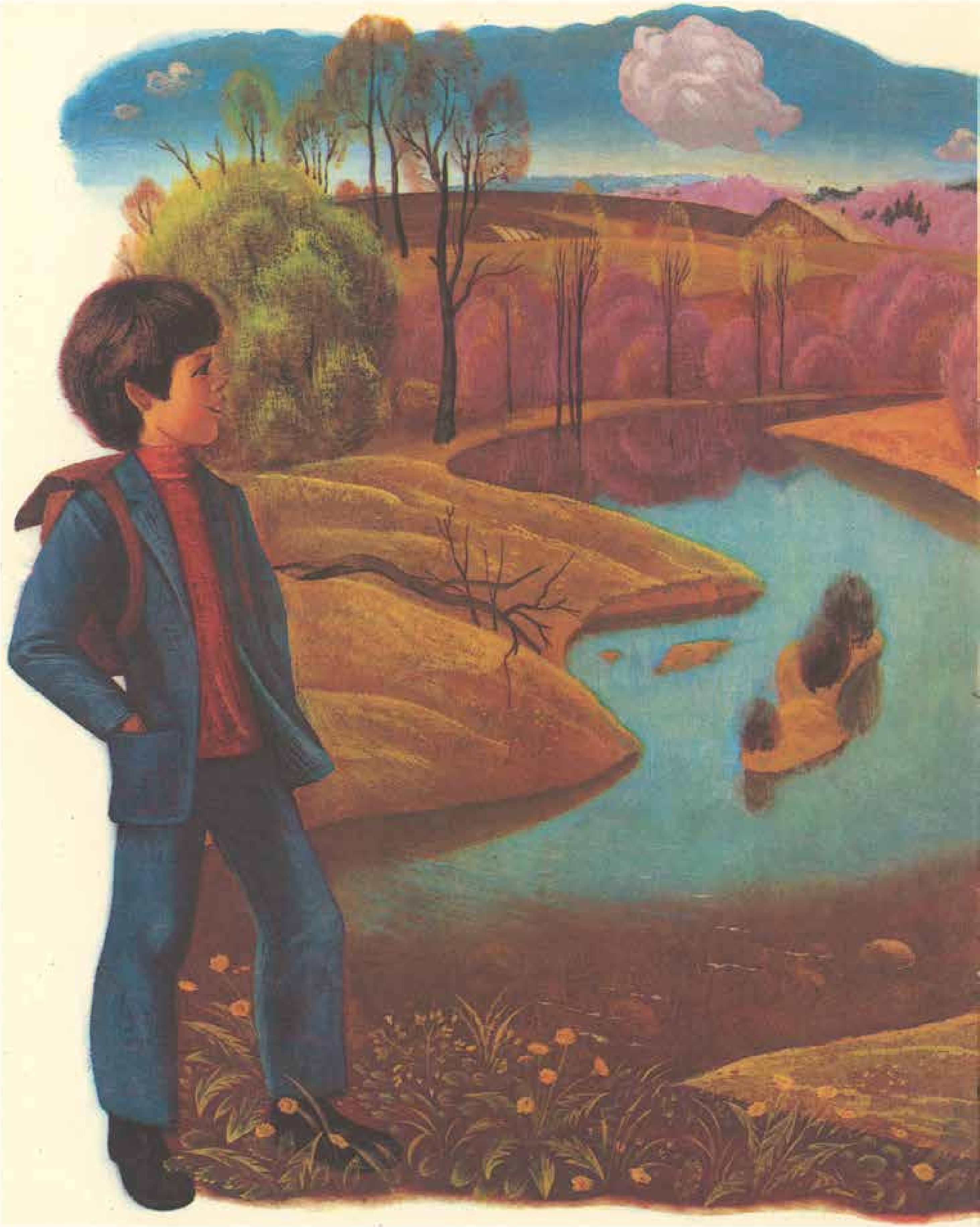
শেষকালে একদিন মেয়েটা জিজ্ঞেস করে বসল: 'রূপকথা না গান, কোন্‌টা ভালো, মা?'

'সূর্য না আকাশ? — কোন্‌টা ভালো, তুই ভেবেই দ্যাখ্‌ না। তুই যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিস, তাহলে আমি বলব কোন্‌টা ভালো, — রূপকথা না গান,' মা জবাব দিলেন।

মেয়েটা অনেকক্ষণ ভাবল, কিন্তু ভেবে কিছুই বার করতে পারল না। সে আকাশের দিকে তাকাল, তাকাল উজ্জ্বল সূর্যটার দিকে। সূর্য না আকাশ, কোন্‌টা যে ভালো তা বলা অসম্ভব হয়ে পড়ল। দুইই অপূর্ব, তাদের আলাদা আলাদা করে দেখা যায় না।

এরপর থেকে মেয়েটি আর জিজ্ঞেস করত না, কোন্‌টা ভালো। সে প্রশ্ন করত অন্য ধরনে — রূপকথা কিসে ভালো? কিসে ভালো গান?

মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মা আনন্দ পেতেন।





ফুল, না নেকড়ের হাঁ?

সের্গেইকা আর মিকোলা — দুটি ছোট ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি যাচ্ছিল।

সের্গেইকাকে হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। আজ স্কুলের দিদিমণি তাকে তিনটে প্রশ্ন করেছেন, তিনটেরই সে ঠিকঠিক উত্তর দিয়েছে।

কিন্তু মিকোলাকে দেখাচ্ছিল বিষণ্ণ আর মনমরা। দুবার তার ডাক পড়েছে ব্ল্যাকবোর্ডে। মিকোলা ভালোমতো উত্তর দিতে পারে নি, দিদিমণিও তাই ওর মন্তব্যের খাতায় খারাপ নম্বর লিখে দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি ওকে এও বলেছেন যে ওর মা'র সঙ্গে দেখা হলে ওর নম্বর সম্পর্কে তাঁকে বলে দেবেন।

বসন্তের দিন, আরামের গরম। সূর্য ঝলমল করছে। নীল আকাশের গভীরে ভাসছে একটা সাদা মেঘের খণ্ড। সের্গেইকা মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল:

'দ্যাখ দ্যাখ মিকোলা, কী সুন্দর মেঘটা! সাদা গোলাপের মতো দেখতে। দ্যাখ দ্যাখ, ওর পাপড়িগুলো খুলে গেল — কী নরম আর সরু সরু! বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে।'

মিকোলা অনেকক্ষণ মেঘটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তারপর নরম গলায় বলল:

'কোথায় আবার পাপড়ি? কোথায় ফুল? মেঘটা ত দেখছি নেকড়ের মতো দেখতে। চেয়ে দ্যাখ — ঐ যে ওদিকে ওর মাথা। জন্তুটা হাঁ করল — রাগে গরগর করছে, যেন এক্ষুনি কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

ওরা দুজনে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল মেঘের টুকরোটা, দুজনেই যে যেমন ভেবেছিল তেমনি দেখতে পেল।





নীলকণ্ঠ কেন কাঁদে ?

গ্রামের এক প্রান্তে একটা কুঁড়ে ঘরে বাস করত স্বামী আর স্ত্রী। তাদের ছিল দুই ছেলেমেয়ে। ছেলেটার নাম মিশা, আর মেয়েটার — ওলিয়া। মিশার বয়স দশ বছর, ওলিয়ার — নয়।

বাড়ির পাশে ডালপালা ছড়িয়ে বেড়ে উঠেছে একটা অশ্বত্থগাছ।

'অশ্বত্থগাছের ডালে আমরা একটা দোলনা বাঁধব,' মিশা বলল।

'ওঃ কী মজাই না লাগবে দোল খেতে!' খুশি হয়ে বলল ওলিয়া।

মিশা অশ্বত্থগাছে চড়ে বসল, গাছের ডালে দড়ি বাঁধল।

মিশা আর ওলিয়া দোলনায় চড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল।

ওরা দু'জনে দোল খেতে থাকে, এদিকে তাদের কাছাকাছি উড়ে উড়ে গান গেয়ে চলে একটা নীলকণ্ঠ পাখি।

মিশা তার বোনকে বলল:

'আমরা দুলছি দেখে নীলকণ্ঠ পাখিটারও ফুর্তি হচ্ছে।'

গাছের গুঁড়িতে ওলিয়ার চোখ পড়ল, সে দেখতে পেল ওখানে একটা কোটর, আর কোটরে একটা ছোট্ট পাখির বাসায় এইটুকুন পাখির ছানা।

'নীলকণ্ঠের মোটেই ফুর্তি হচ্ছে না, ও কাঁদছে,' ওলিয়া বলল।

'কেন, ও কাঁদছে কেন?' অবাক হয়ে বলল মিশা।

'ভেবেই দ্যাখ না কেন,' উত্তরে ওলিয়া বলল।

মিশা দোলনা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, নীলকণ্ঠ পাখির বাসার দিকে চেয়ে দেখল, আর তখনই বুঝতে পারল নীলকণ্ঠ কেন কাঁদে।





চিরকালের অশ্বত্থগাছ

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে এক বুড়ো থুত্থুড়ে অশ্বত্থগাছ। শীতকালে তার পাতাঝরা ডালপালাগুলো ভয়ঙ্কর রকমের আওয়াজ তোলে, বসন্তকালে অশ্বত্থগাছ ঢেকে যায় সবুজ পাতায়। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি: দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন এক পাহারাদার। আমি মা'কে জিজ্ঞেস করি:

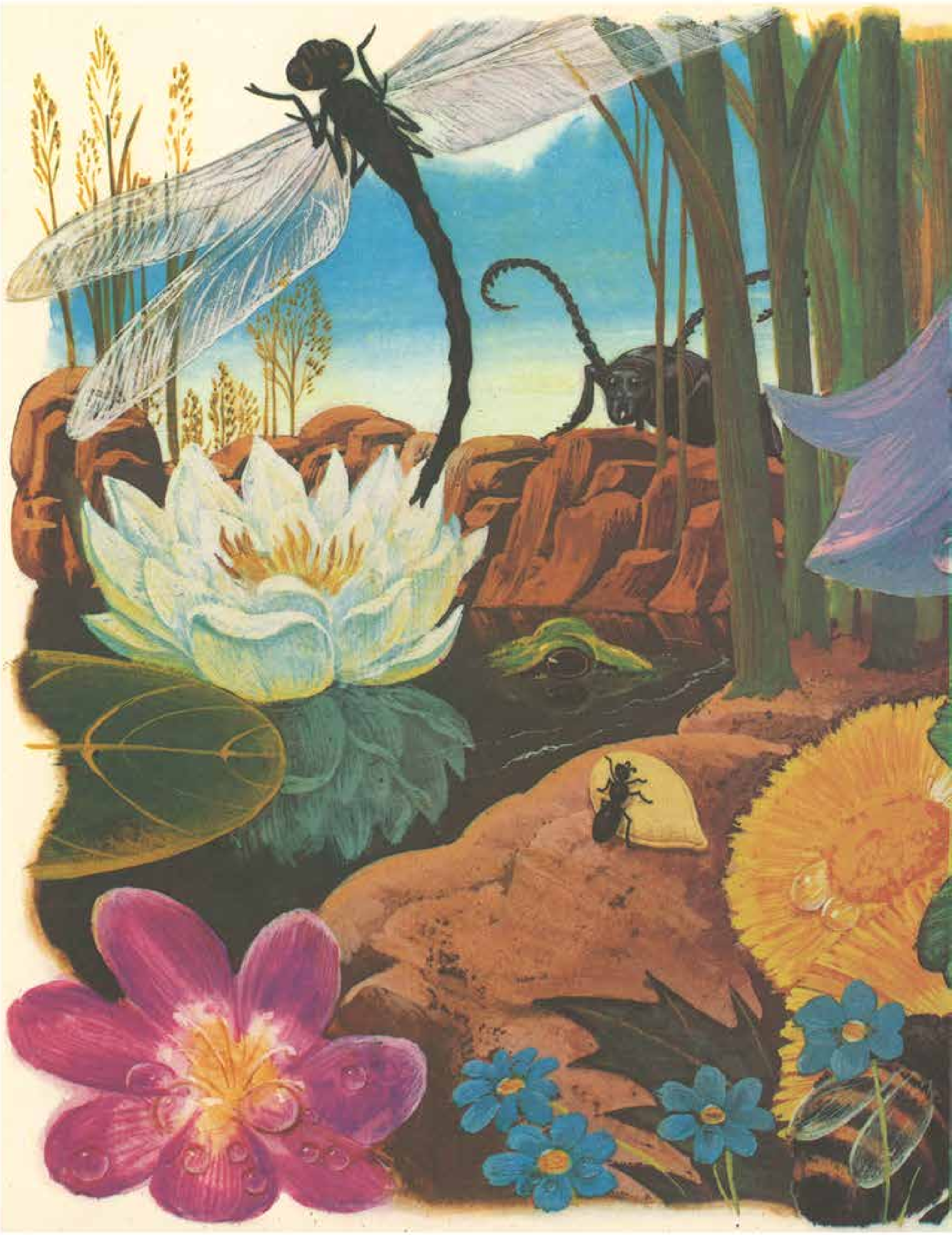
'আমাদের এই অশ্বত্থগাছটার বয়স কত? কে এটাকে বসিয়েছে?'

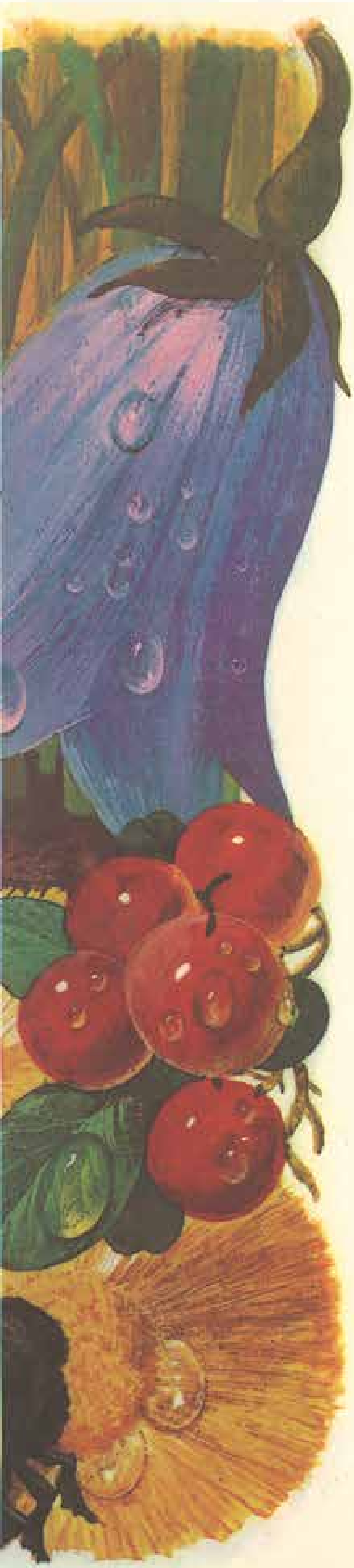
'জানি না,' মা জবাব দিলেন। 'জ্ঞান হওয়া অবধি অশ্বত্থগাছটাকে রাস্তার ধারে দেখে আসছি।'

দাদুকে জিজ্ঞেস করলাম:

'আচ্ছা দাদু, বলতে পার আমাদের এই অশ্বত্থটার বয়স কত? কে এটাকে বসিয়েছে?'

'মনে নেই,' দাদু উত্তর দিলেন। 'চিরকাল দেখে আসছি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে। আপন মনে বাড়ছে, সবাইকে আনন্দ দিচ্ছে। এই অশ্বত্থগাছটাকে যে লাগিয়েছে তাকে ভালো মানুষ বলতে হবে। আমার মনে আছে ছেলেবয়সে এর তলায় খেলা করেছি, তোর মাও তার বান্ধবীদের নিয়ে এখানে মালা গাঁথত, আর এখন তুই খেলা করছিস এর ছায়ায়।'





একগুঁয়ে পিঁপড়ে

একটা কালো কুচকুচে ছোট্ট পিঁপড়ে ছুটছিল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে যাচ্ছিল তার বাড়ির দিকে। সে তার ছানাপোনাদের জন্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এইটুকুন একটা পোস্তদানা। এমন সময় সে দেখতে পেল পথের ওপর পড়ে আছে একটা কুমড়োর বীচি। বীচিটা বড়সড়, মিষ্টি, সেটার গন্ধও চমৎকার। পিঁপড়ে পোস্তদানা একপাশে সরিয়ে রাখল। কুমড়ো বীচিটা পিঠের ওপর তুলে নিল, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, বীচিটা পড়ে গেল। পিঁপড়ে ফের পিঠে তুলল, কিন্তু এবারেও পড়ে গেল। এইভাবে অনেক বার সে বীচি ওঠালো, কিন্তু বারবারই কেবল পড়ে যায়।

এমন সময় পিঁপড়ে শুনতে পেল কে যেন চাপা হাসি হাসছে।

এদিক ওদিক ফিরে তাকাতে দেখতে পেল পথের ধারে বসে আছে একটা ফড়িং।

'বীচিটাকে তুমি এর মধ্যে হাজার বার তুলে দেখলে,' ফড়িং বলল। 'তোমার কি বিরক্তি ধরে যায় নি? ও তোমার কম্ম নয়। বীচিটার আশা ছাড়, ওটাকে তার নিজের মনে পড়ে থাকতে দাও।'

'কম্ম নয় তারই, যে ব্যর্থতাকে গ্রাহ্য করে,' পিঁপড়ে উত্তর দিল।

বলেই সে ফের বীচিটাকে নিয়ে লেগে পড়ল। পিঠে তুলে বাড়িতে বয়ে নিয়ে গেল। এবারে আর গড়িয়ে পড়ল না।

দেখলে ত কেমন একগুঁয়ে পিঁপড়ে!





আমার মা দুনিয়ার সেরা সুন্দরী

মা-পেঁচার ছিল এক ছানা। বড়সড়, ছাইরঙা তার ডানা। চোখদুটো তার বড় বড় আর মুখটাও বড়।

পেঁচারা ওড়ে কেবল রাতের বেলায়। তারা কড়া রোদ্দুরকে ভয় পায়। তাই মা-পেঁচা ছেলেকে শেখায়:

'দিনের বেলায় কোটর থেকে বেরোবি না কিন্তু। সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাবে — বাড়ির পথ খুঁজে পাবি নে।'

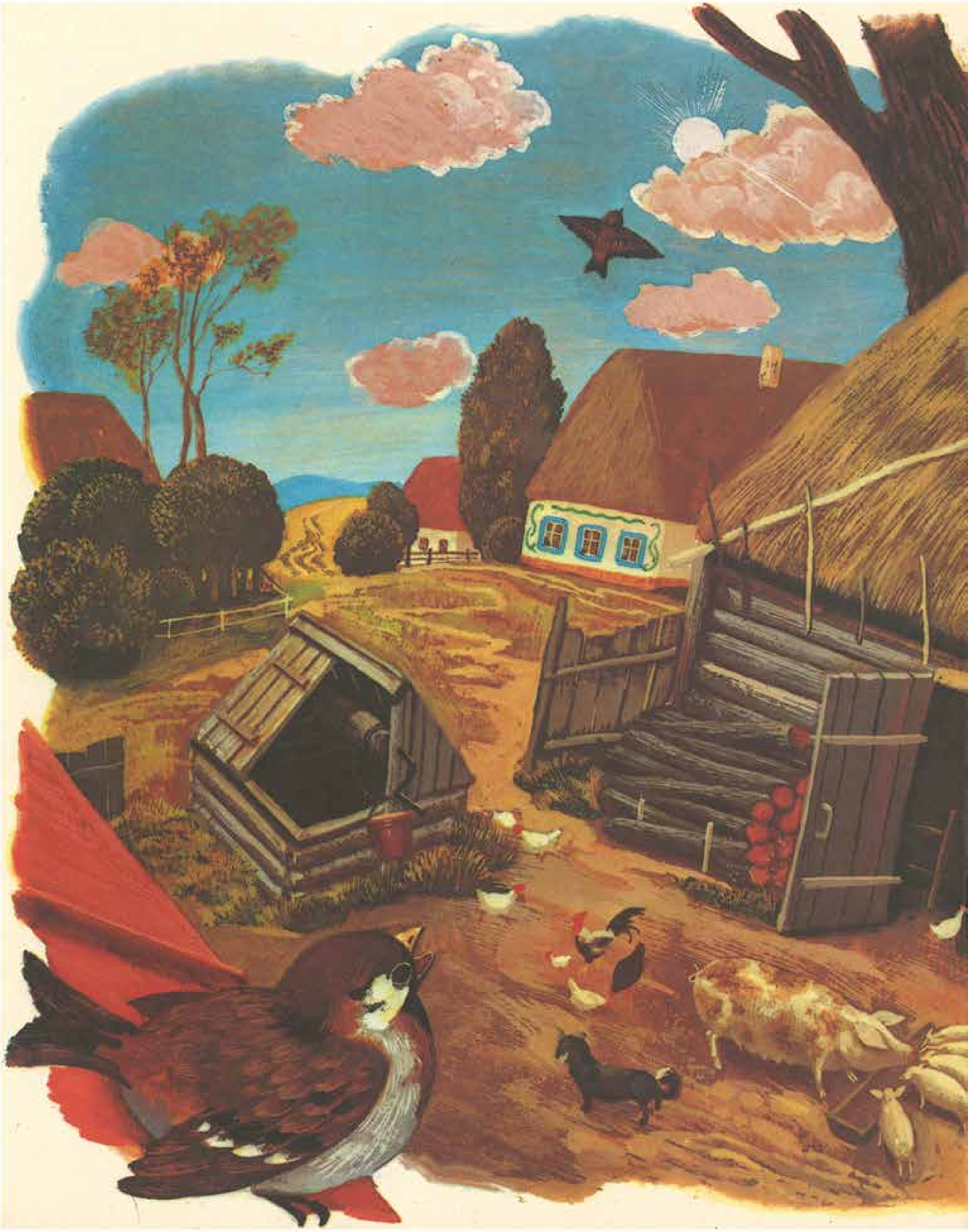
পেঁচার ছানাটা ছিল অবাধ্য। সে তার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল, চোখ কুঁচকে ঘেসো মাঠের দিকে উড়ে চলল। সেখানে গিয়ে সে চোখ খুলে সূর্যের দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। ঘাসের মধ্যে বসে বসে সে কাঁদতে থাকে। একটা বক তার দিকে এগিয়ে এলো।

'তুই কাদের ছানা রে?' বক জিজ্ঞেস করল।

'আমি পেঁচার ছানা। আমার মা পেঁচানি। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে মা'র কাছে নিয়ে চলুন।'

'তোর মা দেখতে কেমন শুনি?'

'আমার মা দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। তার চোখদুটো এমনই দরদ আর ভালোবাসা মাখানো, এমনই নরম যে কী বলব! অমন চোখ কেবল আমার মা'রই আছে, আর কারও নেই।'





চড়াইছানা আর আগুন

বুড়ি মা-চড়াই শেষকালে তার ছোট্ট ছেলেটিকে বাসা থেকে ওড়ার অনুমতি দিল। চড়াইছানা ফড়ফড় করে উড়তে থাকে আর অবিরাম তার মা'কে জিজ্ঞেস করে চলে: এটা কী? ওটা কী?

মা তাকে বুঝিয়ে বলল মাটি কী, ঘাস-গাছপালা কী, হাঁস-মুরগী কী, পুকুরই বা কী। এমন সময় চড়াইছানা আকাশে বিশাল আগুনের গোলা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা এটা কী?'

'এটা সূর্য,' মা-চড়াই উত্তর দিল।

'সূর্য কী?' চড়াইছানা ছাড়ার পাত্র নয়।

'তোর তা জেনে কী হবে?' বিরক্তির সুরে উত্তর দিল পরম বিজ্ঞ মা-চড়াই। 'সূর্য হল গিয়ে আগুন।'

'আগুন কী, আমার জানতে ইচ্ছে করছে,' কিচিরমিচির করে এই কথা বলে চড়াইছানা উড়াল দিল ওপরে, আরও ওপরে, ক্রমেই সূর্যের কাছে, আরও কাছে।

উড়তে উড়তে শেষকালে সে ঝলসে ফেলল তার ডানার সরু সরু পালকগুলো। ভয় পেয়ে সে ফিরে এলো। অপেক্ষা করতে করতে মা'র ততক্ষণে মরমর দশা।

'হ্যাঁ, এইবারে আমি জানি আগুন কাকে বলে,' চড়াইছানা বলল।





কুঁড়ে আর সূর্য

এক প্রচণ্ড গরমের দিনে কুঁড়ে বনে গেল। বনের মাঝখানে এক ছায়াঘেরা ফাঁকা মাঠে সে শুয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ল নরম ঘাসের মধ্যে। সে যতক্ষণ ঘুমোতে লাগল ততক্ষণে সূর্য আকাশের গা বয়ে অনেকখানি পথ ধরে যেতে যেতে গিয়ে উঠল একেবারে মধ্য আকাশে। সূর্যকিরণে বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গাটা ঝলমল করে উঠল। কুঁড়ে তার মাথায় আর পায়ে রোদের জ্বালা টের পেল। কুঁড়ের ইচ্ছে হচ্ছিল ওখান থেকে উঠে গিয়ে ছায়ার নীচে, ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর সরে যায়, কিন্তু তার আলস্য লাগছিল।

কুঁড়ে সূর্যকে বলল:

'সূয্যি ভাই, দয়া করে একটু সরে যাও না, আমার গরম লাগছে।'

সূর্য হেসে উঠে বলল:

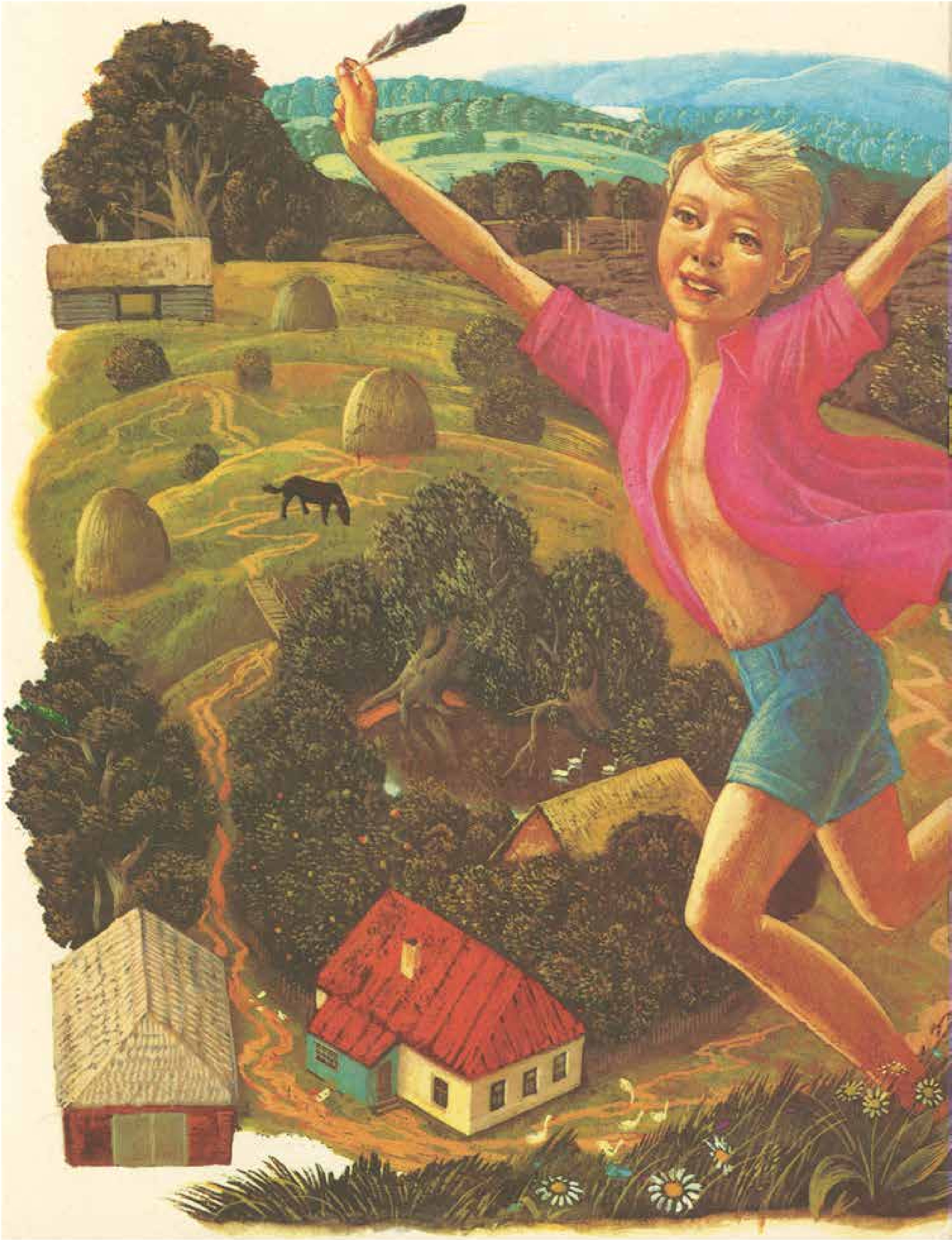
'কুঁড়ের ইচ্ছেমতো সূর্য সরে যাবে, এটা কী একটা কাজের কথা হল!'

কুঁড়ে রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'তার মানে, তুমি সরে যেতে চাইছ না!'

'না, চাই না,' সূর্য উত্তর দিল।

'বটে, তাহলে তোমার কোন তোয়াক্কা না করে আমি এখানেই শুয়ে থাকব!' কুঁড়ে বলল।





পাখনায় গান গায়

কাদাখোঁচা নামে এক ধরনের আশ্চর্য পাখি আছে। সে গান গায়। কিসে গান গায় তোমরা বলতে পার কি ছেলেমেয়েরা? সে গান গায় তার ডানা দিয়ে। তার ডানায় আছে বিশেষ রকমের গাইয়ে পালক। ওড়ার সময় কাদাখোঁচার যখন গাইবার ইচ্ছে হয় তখন সে তার ডানা এমন ভাবে ছড়ায় যে গাইয়ে পালক বেরিয়ে এসে গানের আওয়াজ বার করে। শোনা যায় এমন এক তীক্ষ্ম শিসের আওয়াজ। এর সঙ্গে অন্য কোন আওয়াজের তুলনাই হয় না। অতি সূক্ষ্ম তারের ওপর ছড় টানলে যেমন আওয়াজ হয় এ যেন অনেকটা সেই রকম, আবার অনেকটা যেন কাশের সরু ডাঁটার ভেতরে বাতাস বইলে যেমন সুর বেরোয় সেই রকম।

কিন্তু একদিন একটা বিপদ ঘটে গেল। কাদাখোঁচা তার গাইয়ে পালকটা হারিয়ে ফেলল। পালকটা খসে মাটিতে পড়ে গেল। কাদাখোঁচার গাইতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এদিকে গাইয়ে পালকটা নেই।

ছোট্ট ছেলে সেরিওজার হাতে পড়ল কাদাখোঁচার ঐ পালকটা। পালকটা তুলে নিয়ে সে ছুট দিল — পালক গান গেয়ে উঠল। কাদাখোঁচা তার নিজের পাখনার গান শুনতে পেয়ে ছেলেটার কাছে উড়ে এসে অনুনয় করে বলল:

'খোকা, আমার গাইয়ে পালকটা আমাকে দিয়ে দাও। গান ছাড়া আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব।'

সেরিওজা অবাক হয়ে কাদাখোঁচাকে পালকটা দিয়ে দিল।

ছোট্ট সেরিওজা বড় হল, তারপর বহুকাল সে বেঁচে রইল এই পৃথিবীতে। বহুবার কাদাখোঁচার কথা তার মনে হত, মনে হতেই সে ভাবত প্রতিটি মানুষেরই আছে এমন পাখনা, যে পাখনায় সে গান গায়। যে মানুষের সে পাখনা নেই সে অভাগা।

43 к.

মূল রুশ থেকে অনুবাদ : অরুণ সোম

В. Сухомлинский
ПОЮЩЕЕ ПЕРЫШКО
На языке бенгали

V. Sukhomlinsky
THE SINGING FEATHER
in Bengali

Перевод сделан по книге
В. Сухомлинский. Поющее перышко.
М. «Дет. лит.», 1979 г.

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

ছোট শিশুদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ИБ № 1900

Редактор русского текста В.А. Близненкова
Контрольный редактор В.Н. Горонова
Художник В.В. Шульженко
Художественный редактор Е.А. Финогенова
Технические редакторы Е.Ю. Лунева,
О.Б. Иванова
Корректор Л.Л. Михайлова

Сдано в набор 17.04.85. Подписано в печать 26.07.85. Формат 84x108/16. Бумага офсетная. Гарнитура Бенгали. Печать офсетная. Условн. печ.л. 5,88. Усл.кр.-отт. 23,52. Уч.-изд.л. 3,62. Тираж 20360 экз. Заказ № 4889. Цена 43 к. Изд. № 1218.

Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17.

Фирма-партнер: Маниша Грантхалая, Калькутта, Индия

Ленинградская фабрика офсетной печати № 1 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 197101, ул. Мира, 3.

С $\frac{4803010102-116}{031(05)-85}$ 098–85



ISBN [illegible]